করে দেখ

গোপালচন্দ্র ভট্টাচা

করে দেখ

করে দেখ

তৃতীয় খণ্ড

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

আশা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ
অগাস্ট ১৯৭৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৫ বৈশাখ ১৩৮৪, ৮ মে ১৯৭৭

প্রকাশক
শীলা ভট্টাচার্য
আশা প্রকাশনী
৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
রবীন্দ্রনাথ দাশ
মুদ্রাকর প্রেস
১০/১ সি, মারহাট্টা ডিচ লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৩

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

দাম ৫·০০

Kore Dekha (Part III)
by Gopalchandra Bhattacharya

সূচীপত্র

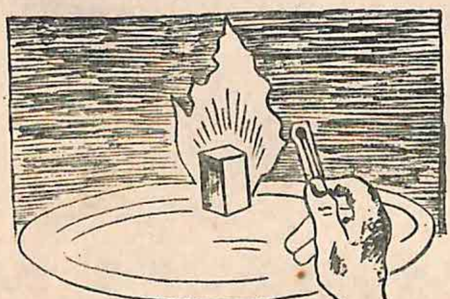
উৎসর্গ

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
শ্রীমতী লীলা রায়

চিনির দানায় আগুন জ্বালাবার কৌশল

কোন কোন পদার্থের উপস্থিতিতে কতকগুলি রাসায়মিক বিক্রিয়া ত্বরান্বিত বা সহজে নিষ্পন্ন হয়, অথচ বিক্রিয়ার ফলে সেই পদার্থটির কোনই পরিবর্তন ঘটে না। রসায়ন শাস্ত্রে এরূপ পদার্থকে ক্যাটালিষ্ট (catalyst) বা অনুঘটক বলা হয়ে থাকে। ক্যাটালিষ্টের এই অদ্ভুত কার্যকারিতার বিষয় খুব সহজ একটি পরীক্ষা করে দেখতে পার। এই পরীক্ষার জন্যে দরকার হবে দেশলাই, সামান্য কিছু সিগার বা সিগারেটের ছাই এবং বড় রকমের একটি চিনির দানা। আজকাল সচরাচর আমরা সরু এবং মোটা দানার চিনি ব্যবহার করে থাকি ; কিন্তু সেগুলি ছাড়াও চিনির বেশ বড় বড় চৌকা দানা পাওয়া যায়।

এই রকমের বড় চিনির দানা সংগ্রহ করে একটা দানা একখানা প্লেটের উপর রেখে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে তাতে আগুন ধরাতে পার কি না—চেষ্টা করে দেখ। কিন্তু যতই চেষ্টা কর না কেন, কিছুতেই সেটাতে আগুন জ্বালাতে পারবে না।



—২

এবার চিনির দানাটার একদিকে একটু সিগারেটের ছাই ঘষে দাও। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে এবার ছাই-ঘষা দিকটাতে লাগালেই দেখবে, দানাটাতে আগুন ধরে গেছে এবং সেটা বেশ সহজভাবেই জ্বলতে সুরু করেছে।

এ থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায়, ছাইটা এখানে ক্যাটালিষ্ট বা অনুঘটকের কাজ করছে। ছাইটা-ই চিনির দানার প্রজ্বলনে সহায়তা করেছে। ছাই কিন্তু নিজে প্রজ্বলনক্ষম নয় এবং দহন কালেও সেটা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতই থেকে যায়।

ঝুলন্ত চাউল

তোমরা অনেকেই হয়তো যাছকর বা বেদেদের ম্যাজিকের খেলা দেখেছ। এই যাছকরেরা সময় সময় এমন সব অদ্ভুত খেলা দেখায়, সাধারণ বুদ্ধিতে যার কোন ব্যাখ্যাই খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই রকম একটা খেলার কথা বলছি। পেট-মোটা, চওড়া মুখওয়ালা একটা গোলাকার পাত্রের কানায় কানায় চাউল ভর্তি করে যাছকরের সামনে রাখা হলো।

যাছকর তার ঝোলার ভিতর থেকে বেশ চকচকে একখানা ছোরা বের করে সেটাকে খাড়াভাবে চাউলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার বের করে নিল। কিছুক্ষণ এরকম করবার পর ছোরাটাকে তুলে এনে সবাইকে দেখিয়ে গেল। তারপর লেড়কালোক এক দফে হাততালি লাগাও, ভানুমতীকা খেল দেখো—বলেই ছোরাটাকে আবার সেই চাউলের মধ্যে ঢুকিয়ে ছোরার বাঁটটা ধরে উঁচুতে তুললো। অবাক কাণ্ড! ছোরার সঙ্গে চাউল ভর্তি পাত্রটাও উঁচুতে ঝুলে রইলো।

কেমন করে সেটা সম্ভব হলো? ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে তোমরাও এটা করে দেখতে পার। একটা শক্ত কাচের জার জোগাড় কর। জারের পেটের দিকটা যেন তার মুখের চেয়ে বেশ মোটা অর্থাৎ চওড়া হয়। জারটার কানায় কানায় চাউল ভর্তি কর এবং

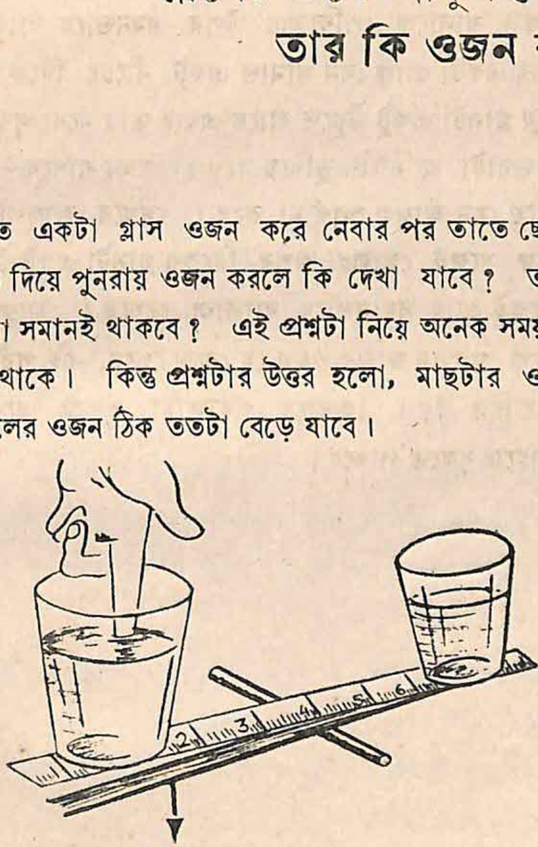
বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চেপে চেপে বেশ করে বসিয়ে দাও। এবার একখানা ছোরা নিয়ে সেটাকে বেশ একটু জোর দিয়ে সোজাসুজিভাবে চাউলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার তুলে আন। কিছুক্ষণ ধরে বার বার এই রকম করলেই দেখবে, জারের মধ্যে চাউলগুলি যেন শক্তভাবে পরস্পরের গায়ে এঁটে গেছে। তখন ছোরাটাকে আবার বেশ জোরের সঙ্গে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। এবার ছোরার বাঁট ধরে উপরে তুললেই দেখবে—ফল, মূল, কাঠ ইত্যাদি নমনীয় শক্ত পদার্থের মধ্যে জোর করে ছোরা ঢুকিয়ে দিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি ভাবেই চাউলের জারটা ছোরার সঙ্গে আট্‌কে ঝুলে আছে।



এটা কেমন করে সম্ভব হয়? একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে। ছোরাটাকে বেশ জোরের সঙ্গে বার বার চাউলের মধ্যে ঢোকাবার ফলে চাউলগুলি পরস্পর ঠাসাঠাসি করে পাত্রটার গায়ে বেশ শক্তভাবে চেপে বসে। এই অবস্থায় জোর করে ছোরাটাকে চাউলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে পাত্র সমেত চাউলগুলি একটা শক্ত পদার্থের মত ছোরাটার গায়ে এঁটে থাকবে।

গ্লাসের জলে আঙ্গুল ডোবালে তার কি ওজন বাড়ে ?

জল সমেত একটা গ্লাস ওজন করে নেবার পর তাতে ছোট্ট একটা মাছ ছেড়ে দিয়ে পুনরায় ওজন করলে কি দেখা যাবে ? তার ওজন বাড়বে, না সমানই থাকবে ? এই প্রশ্নটা নিয়ে অনেক সময় বিতর্কের সৃষ্টি:হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্নটার উত্তর হলো, মাছটার ওজন যতটা গ্লাসের জলের ওজন ঠিক ততটা বেড়ে যাবে।



ধর, একগ্লাস জলে তুমি একটা আঙ্গুল খানিকটা ডুবিয়ে দিলে অনেকেই বলবে, এতে ওজন কিছুই বাড়বে না। প্রকৃতপক্ষে ওজন কিছুটা বেড়েই যাবে। আঙ্গুল ডুবিয়ে দেবার ফলে যতটা জল স্থানচ্যুত হবে, তার ওজন যতটা, গ্লাসের জলের ওজন ঠিক ততটাই

বেড়ে যাবে। ব্যাপারটা খুব সহজেই তোমরা পরীক্ষা করে দেখতে পার।

টেবিলের উপর একটা পেন্সিল রাখ। পেন্সিলটার উপর আড়া-আড়িভাবে একখানা চ্যাপ্টা স্কেল বা রুলার রেখে তার তুই প্রান্তে একই রকমের তুটি জল ভর্তি গ্লাস ব্যালান্স করে বসিয়ে দাও। গ্লাস বসানো স্কেল খানাকে পেন্সিলের উপর এমনভাবে ব্যালান্স করে বসাবে, তার একটা প্রান্ত যেন সামান্য একটু নীচের দিকে হেলানো থাকে। যে গ্লাসটা একটু উঁচুতে আছে এবার তার মধ্যে খুব সাবধানে আঙ্গুলের ডগাটা খানিকটা ডুবিয়ে দাও। লক্ষ্য রাখবে—জল ছাড়া অন্য কোথাও যেন আঙ্গুল স্পর্শ না করে। দেখবে আঙ্গুলটা ডুবিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই স্কেলের অপর দিকের গ্লাসটা একটু উপরে উঠে গিয়ে তুদিকেই প্রায় সমানভাবে ব্যালান্স হয়েছে। আঙ্গুল ডুবিয়ে দেবার ফলে গ্লাসের জলের ওজন যে বেড়ে গেছে, এই পরীক্ষাতে সে কথাই প্রমাণিত হয়। কিভাবে পরীক্ষাটা করতে হবে, ছবিটা দেখলেই সহজে বুঝতে পারবে।

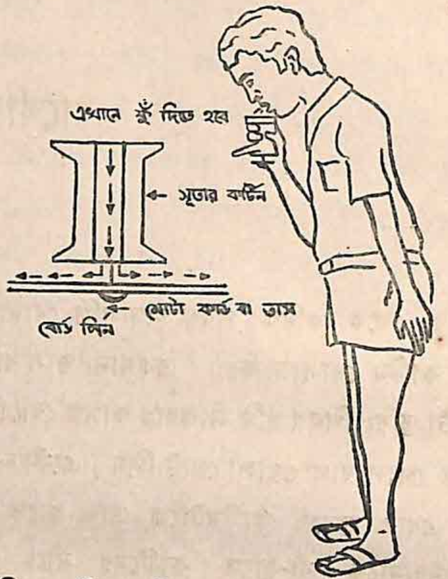
বার্ণোলীর সূত্র

মাঝখানে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত লম্বালম্বি মোটা ছিদ্রওয়ালা একটা সূতার কাটিম যোগাড় কর। একখানা তাস বা শক্ত কার্ডের মাঝামাঝি একটা ড্রয়িং পিন (ছবি আঁকবার কাগজ বোর্ডে এঁটে দেবার জন্যে বেশ বড় গোল মাথাওয়ালা ছোট্ট পিন) এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফুটিয়ে দাও। এবার সূতার কাটিমটাকে ডান হাতে ধর। পিন ফোটানো কার্ডখানাকে বাঁ-হাতে কাটিমের নীচে ধর। এবার কাটিমটার উপরে ছিদ্রের মুখে যত জোরে পার মুখ দিয়ে ফুঁ দাও। ফুঁ দেবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য বাঁ-হাতে ধরা কার্ডখানাকে ছেড়ে দিতে হবে। ছবিটা দেখে নাও, কি ভাবে ফুঁ দিতে হবে সহজেই বুঝতে পারবে।

তোমাদের মনে হতে পারে, ফুঁ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কার্ডখানা মাটিতে পড়ে যাবে। কিন্তু করে দেখ, তা হবে না। যতক্ষণ ফুঁ দেওয়া চলবে, ততক্ষণ কার্ডখানা নীচে না পড়ে কাটিমটার সঙ্গেই লেগে থাকতে চাইবে।

ফুঁ দিলে কার্ডখানা নীচে না পড়ে উপরের দিকে লেগে থাকতে চায় কেন—এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বার্ণোলীর সূত্রে (অষ্টাদশ শতাব্দীর সুইস বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল বার্ণোলীর নামানুসারে এই সূত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে)। এই সূত্রে বলা হয়েছে—যখন কোন বায়বীয়

অথবা তরল পদার্থ গতিশীল অবস্থায় থাকে, তখন তার চাপ কমে যায়। গতিবেগ যত বৃদ্ধি পায়, চাপও তত বেশী কমতে থাকে।



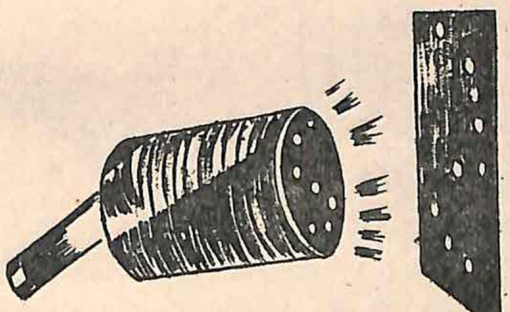
কাটিমের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ফুঁ দিলে কার্ডখানার উপর দিয়ে বাতাস খুব জোরে বইতে থাকে। এর ফলে কার্ডের উপরের দিকের বাতাসের চাপ অনেক কমে যায়। কাজেই কার্ডের নীচের দিকের বাতাসের চাপ উপরের চেয়ে বেশী হবার দরুণ কার্ডখানা পড়ে যায় না।

এরোপ্লেন ওড়বার সময় ঠিক এরূপ ব্যাপারই ঘটে। এরোপ্লেনের ডানা দুটি এমন ভাবে তৈরী যে, ওড়বার সময় ডানার উপরের দিকের বাতাস নীচের দিকের বাতাসের চেয়ে অনেক দ্রুততর বেগে ছুটতে থাকে। কাজেই ডানার নীচের দিকের চেয়ে উপরের দিকে বাতাসের চাপ অনেক কমে যায়। এর ফলে ডানার নীচের দিকের বেশী চাপের বাতাস ভারী প্লেনকে পড়ে যেতে দেয় না।

টিনের চোঙের প্ল্যানেটেরিয়াম

ঘরের দেয়াল বা সিলিং-এর উপর আলোকপাত করে প্ল্যানেটেরিয়ামের মত অতি সুন্দরভাবে নক্ষত্রমণ্ডলের ছবি দেখানো যেতে পারে। খুব সহজেই এই ব্যবস্থা করা যায়।

রাতের আকাশে তোমরা হয়তো কালপুরুষ, সপ্তর্ষি প্রভৃতি নানারকম নক্ষত্রমণ্ডল দেখে থাকবে। এই সব নক্ষত্রমণ্ডলের ছবি অনেক বইতে দেখতে পাবে। তা থেকে যে কোন একটা নক্ষত্রমণ্ডলের ছবি



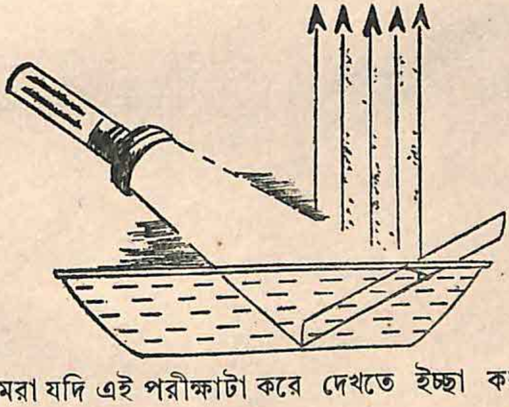
পাত্‌লা কাগজে কপি করে নাও। এবার কার্ডবোর্ড বা টিনের তৈরী একটা মগ যোগাড় কর। মগের তলার দিকটায় ঐ ছবি আঁকা কাগজখানা উল্টো করে লাগিয়ে দাও। কাগজখানা উল্টো করে লাগালেও আঁকা চিহ্নগুলি পরিস্কার দেখা যাবে। তারপর পাঞ্চের সাহায্যে প্রত্যেকটি তারকা-চিহ্নের দাগে দাগে গর্ত করে দাও।

আলোকপাত করলে ঐ গর্তগুলিই দর্পণে প্রতিফলিত চিত্রের মত দেয়ালের গায়ে নক্ষত্রমণ্ডলের সজ্জার আলোক-চিহ্ন ফুটিয়ে তুলবে।

এবার ছিদ্র-করা টিনের মগটিকে অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে তার খোলা মুখের ভিতর দিয়ে একটি টর্চ জ্বালিয়ে দাও। টর্চটাকে একটু হেলানো ভাবে ধরতে হবে, যাতে আলোকরশ্মি গর্তগুলির ঠিক বরাবর না পড়ে চোঙের ভিতরের দেয়ালের গায়ে পড়ে। এর ফলে গর্তের ভিতর দিয়ে নক্ষত্রমণ্ডলের পরিবর্ধিত চিত্র ঠিক স্বাভাবিক ছবির মতই দেয়ালের গায়ে পড়বে। চোঙটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন অবস্থানে নক্ষত্রমণ্ডলটিকে কিরূপ দেখায় তা সহজেই বুঝতে পারবে।

আয়নার সাহায্যে আলোর বর্ণছত্র উৎপাদন

প্রিজম্ অর্থাৎ ত্রিকোণ-কাচের ভিতর দিয়ে সূর্যরশ্মি প্রেরণ করলে রামধনুর রং দেখা যায়—নিউটনের এই বিখ্যাত পরীক্ষার কথা তোমাদের প্রত্যেকেরই হয়তো জানা আছে। কিন্তু ত্রিকোণ-কাচ সংগ্রহ করা তোমাদের অনেকের পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব হবে না।



কাজেই তোমরা যদি এই পরীক্ষাটা করে দেখতে ইচ্ছা কর, তাহলে সাধারণ একখানা মুখ-দেখা আয়নার সাহায্যেও অনায়াসে এরূপ বর্ণছত্র উৎপাদন করতে পার। এর জন্যে দরকার হবে একটা টর্চ, মুখ দেখবার একটা ছোট্ট আয়না। আয়নাটার বেশ খানিকটা অংশ পাত্রের জলের মধ্যে কাৎভাবে ডুবিয়ে পাত্রের কানার গায়ে ঠেস দিয়ে

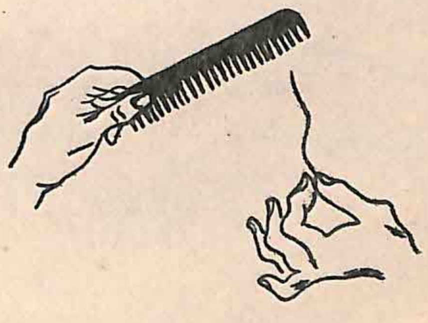
রাখ। পাত্রের জলের উপরিতল থেকে আয়নাটি যেন প্রায় ৩০ ডিগ্রি হেলানো ভাবে থাকে। এবার দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরটাকে অন্ধকার করে দিয়ে টর্চটা জ্বেলে আয়নার জল-নিমজ্জিত অংশের উপর আলো ফেললেই দেখবে উপরে সিলিং-এর গায়ে রামধনু রঙের বর্ণছত্র ফুটে উঠেছে।

এই পরীক্ষায় দেখা যাবে—সাদা আলো বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন বর্ণের আলোর সমবায়ে উদ্ভূত। জলটাই ত্রিকোণ-কাচের মত বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোককে বিভিন্ন কোণে প্রতিসরিত করে বর্ণছত্র উৎপাদন করে।

স্থির বিদ্যুতের খেলা

আমাদের দেশের যাদুকরদের বিখ্যাত দড়ির খেলার কথা তোমরা অনেকেই হয়তো শুনে থাকবে। দড়ির খেলাটা যাই হোক না কেন, তোমরা কিন্তু অনায়াসে এই রকমের একটা ছোট্ট খেলা দেখিয়ে সবাইকে অবাক করে দিতে পার।

ছোট্ট একটুক্‌রা সূতা নাও। সূতাটার এক প্রান্ত এক হাতের দুই আঙ্গুলে চেপে ধর। অপর হাতে ছোট্ট একটা প্লাষ্টিকের চিরুণী নিয়ে সেটাকে বেশ কয়েক-বার তোমার জামা বা কাপড়ে খুব দ্রুতগতিতে ঘষে নাও। চিরুণীটাকে এবার অপর হাতে ধরা সূতার মুক্ত প্রান্তের কাছে নিয়ে গেলেই দেখবে—



সূতাটা চিরুণীর দিকে খাড়া হয়ে উঠবে। চিরুণীটাকে সূতাটার চারদিকে বৃত্তাকারে ঘোরালে সূতার মাথাটাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে থাকবে।

স্থির-বিদ্যুতের জন্যেই এরকম ব্যাপার ঘটে। ঘর্ষণের ফলে কাপড় বা জামার মুক্ত ইলেকট্রনগুলি বেরিয়ে এসে চিরুণীর গায়ে জমা হয়

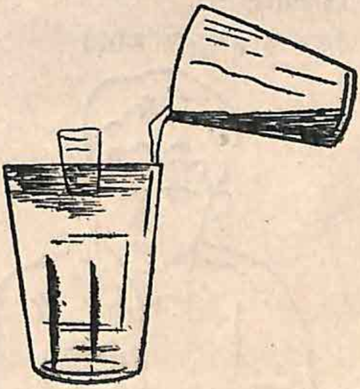
এবং চিরুণীটা ঋণ তড়িতাধানযুক্ত হয়ে পড়ে। সূতাটা ঠিক যেন ইলেক্ট্রোস্কোপের মত কাজ করে। মুক্ত ইলেকট্রনগুলি সূতা থেকে প্রত্যাহত হয় এবং সূতাটা ধন-তড়িতাধানযুক্ত হয়ে থাকে। বিপরীত তড়িতাধানের প্রতি আকর্ষণের ফলে সূতাটা ঋণ-তড়িতাহিত চিরুণীর দিকে আকৃষ্ট হয়।

শীতকালে শুষ্ক আবহাওয়াতেই এই খেলাটি সুন্দরভাবে দেখানো যায়। জল বিদ্যুৎ-পরিবাহক—কাজেই বর্ষার আর্দ্র আবহাওয়ার জলীয় বাষ্পের মাধ্যমে তড়িৎ-পরিবাহিত হয়ে যাবার ফলে খেলাটা ভাল রকমে দেখানো যায় না।

ভাসমান কর্কের খেলা

একটা কাচের গ্লাসের কানার সমান জল ভর্তি করে তাতে ছোট একটা কর্ক্ ছেড়ে দাও। দেখবে কর্ক্টা গ্লাসের এক পাশে লেগে ভেসে আছে। বন্ধুদের বল গ্লাসের কোন দিক স্পর্শ না করে তাদের মধ্যে কেউ জলের ঠিক মাঝখানটায় কর্ক্টাকে ভাসিয়ে রাখতে পারে কি না। কিন্তু তারা যতই চেষ্টা করুক না কেন, কেউ সেটাকে জলের মধ্যস্থলে ভাসিয়ে রাখতে পারবে না।

সবাই যখন অকৃতকার্য হবে, তখন তুমি তাদের দেখিয়ে দিতে পার, কত সহজে এই কাজটা করা যেতে পারে। অন্য একটা গ্লাস থেকে ঐ গ্লাসটার মধ্যে খুব সতর্কভাবে আস্তে আস্তে আর একটু জল ঢেলে দাও, যেন জলটা উপ্‌চে না পড়ে—কানা থেকে সামান্য একটু উঁচু হয়ে থাকে। তলটানের (surface tension) ফলে জলের উপরি ভাগ কুব্জপৃষ্ঠের মত উপরের দিকে ঈষৎ বেঁকে থাকবে। কর্ক্টা তখন আপনা থেকেই গ্লাসের জলের সর্বোচ্চ স্থানে অর্থাৎ ঠিক মধ্য স্থলে গিয়ে স্থির হয়ে থাকবে।



জটিল সমস্যা

●

প্রায় আড়াই ফুট বা তিন ফুট লম্বা সরু এক গাছা দড়ি টেবিলের উপর রেখে তোমার বন্ধুদের জিজ্ঞাসা কর, তাদের মধ্যে কেউ সেই দড়িটার দুই প্রান্ত দুই হাতে ধরে কোন প্রান্ত থেকে হাতের মুঠো না খুলে দড়িটার মধ্যে একটা গেরো দিতে পারে কি না।

দড়িটার দুই প্রান্ত দুই হাতে ধরে রেখে মধ্যস্থলে একটা গেরো দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মনে হলেও খুব একটা সহজ কৌশলেই কিন্তু কাজটা করা যায়।



কৌশলটা হচ্ছে—প্রথমে তোমার হাত দুটি মুড়ে ডান হাতখানা বাঁ-হাতের বাহুর উপরে রাখ এবং বাঁ-হাতখানা ডান-হাতের উপর দিয়ে ডান বাহুর নীচে চালিয়ে দাও। এবার টেবিলের উপর রাখা দড়িটার দুই প্রান্ত দুই হাত দিয়ে ধর। এখন হাত দুইটির ভাঁজ ছেড়ে দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আনলেই দেখবে, দড়িটার মাঝখানে

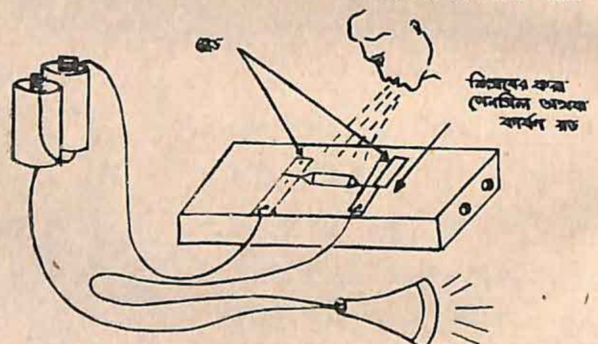
একটা গেরো পড়ে গেছে। ছবিটা লক্ষ্য করলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। ডান হাত বাঁ-হাতের উপর না রেখে বাঁ-হাত ডান হাতের উপর এবং ডান হাত বাঁ-হাতের উপর দিয়ে বাম বাহুর তলায় নিয়ে দড়িটার দুই প্রান্ত ধরে হাত খুলে নিলেই দড়িতে উল্টো মোচড়ের গেরো পড়বে।

সহজ ব্যবস্থায় টেলিফোন

●

তোমরা যদি এক ঘর থেকে আর এক ঘরে অথবা কাছাকাছি এক বাড়ী থেকে আর এক বাড়ীতে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে চাও, তাহলে সহজ উপায়ে একরকম টেলিফোন তৈরী করে নিতে পার।

এই রকমের টেলিফোন তৈরী করতে হলে কয়েকটি জিনিষ যোগাড় করে নিতে হবে ; যথা—খালি একটা সিগারেটের বাক্স, দাড়ি কামাবার দুখানা ব্লেড, দুটি ড্রাই সেল (টর্চের ব্যাটারী), প্রায় ২ ইঞ্চি লম্বা একটা উড পেন্সিল এবং কানে দিয়ে শোনবার জন্যে একটা



ফোন। পুরনো বাতিল মালের দোকান থেকে এই রকম একটা ফোন অনায়াসেই সংগ্রহ করতে পারবে। এছাড়া দরকার হবে প্রয়োজনমত কয়েক গজ সরু ইলেকট্রিক তারের।

জিনিষগুলি যোগাড় করবার পর বাক্সটার উপরের দিকে ছুরি দিয়ে প্রায় দেড় ইঞ্চি তফাতে সমান্তরালভাবে ব্লেডের লম্বা দিকের

সমান দুটি জায়গায় চিরে দাও। এই চেরা ফাঁকের মধ্যে ব্লেড দুখানা বেশ চেপে বসাতে হবে। চেরার মধ্যে ব্লেড দুখানা শক্তভাবে এঁটে না থাকলে সিলিং ওয়াক্স গরম করে চেরার ফাঁকে লাগিয়ে দাও। তারপর ব্লেড দুখানা গরম করে ঐ সিলিং ওয়াক্সের ভিতর দিয়ে চেপে বসিয়ে দিলেই শক্ত হয়ে এঁটে যাবে। তার দিয়ে ড্রাই সেল দুটাকে সিরিজে যোগ করে দাও। এবার ড্রাই সেল-এর এক প্রান্ত থেকে একটি তার নিয়ে একখানা ব্লেডের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বেশ শক্ত করে জুড়ে দাও। অপর ব্লেডখানার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে আর একটি লম্বা তারের এক প্রান্ত জুড়ে দিয়ে অপর প্রান্তটাকে ফোনের একটি পয়েন্টের সঙ্গে যোগ কর। ড্রাই সেল-এর আর এক প্রান্ত থেকে লম্বা তার নিয়ে ফোনের অপর পয়েন্টের সঙ্গে যোগ করে দাও। উড পেন্সিলটার দু-দিক কেটে দু-দিকেই বেশ লম্বা শিষ বের কর। এবার পেন্সিলের দু-দিকে বের করা শিষ ব্লেডের উপর বসিয়ে দাও (পেন্সিলের পরিবর্তে সরু একটা কার্বন রড বসিয়ে দিলেও চলতে পারে)। এখন ফোনটাকে কানে চেপে ধরে পেন্সিলটাকে একটু উঁচু-নীচু বা এদিক-ওদিক সরিয়ে নিলেই নানা রকম আওয়াজ শুনতে পাবে। বাক্সটার উপর একটা পকেট ঘড়ি রাখলে বেশ জোরে টিক্ টিক্ শব্দ শুনতে পাবে। বাক্সটার কাছে কথা বললে, বাক্সটা ঘষ্‌লে বা টেবিলটাকে নাড়লে ফোনে তার শব্দ পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যাবে। এর কারণ হচ্ছে বাক্সটার কাছে কথা বললে বাতাসে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, সেটা বাক্সটাকে কাঁপিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্লেডের উপর স্থাপিত পেন্সিল বা কার্বন রড্‌টাও তদনুযায়ী কাঁপতে থাকে। ফলে ড্রাই সেল থেকে যে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়, তার মধ্যেও একটা ওঠা-নামা চলে। এই তড়িৎ-স্রোত ফোনের ইলেকট্রো-ম্যাগ্‌নেটের মধ্য দিয়ে চলবার সময় ফোনের ভিতরের ডায়াফ্রামটাকে (পর্দাকে) অনুরূপ ভাবে কাঁপিয়ে শব্দ সৃষ্টি করে।

পয়সার নৃত্য

●

সোডাওয়াটার, সরবৎ বা জল ভর্তি বোতল রেফ্রিজারেটরে রেখে ঠাণ্ডা করে নেওয়া হয়। ঠাণ্ডা করা এক বোতল জল গ্লাসে ঢেলে নেবার পর খালি বোতলটা বেশ কিছুটা ঠাণ্ডা থাকে। খালি বোতলটাকে টেবিলের উপর রেখে তার খোলা মুখের উপর আঙ্গুল দিয়ে হু-এক ফোঁটা জল লাগিয়ে দাও। এবার বোতলটার জল



লাগানো মুখের উপর একটা তামার পয়সা (পয়সা না পেলে ঐ রকমের একটা তামার বা পিতলের চাক্তি হলেও চলবে) বসিয়ে দাও। পয়সাটা জলের সঙ্গে বোতলের মুখে এমনভাবে লেগে যাবে যে, কোথাও একটু ফাঁক থাকবে না।

এবার হু-হাত দিয়ে বোতলটাকে বেশ শক্ত করে চেপে ধরে থাক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবে পয়সাটা একটু একটু ওঠা নামা করছে এবং তার ফলে খুট্ খুট্ শব্দ হচ্ছে। এবার তোমার হাত সরিয়ে নিলেও দেখবে—তখনও পয়সাটার শব্দ সমানভাবেই চলছে। কেন এমন হয়, সেটা সহজেই বুঝতে পারবে। গরম দিলে বাতাস যে প্রসারিত হয়, এটা তারই একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত। বোতলের মধ্যে যে ঠাণ্ডা বাতাস ছিল, হাতের গরমে সেটা প্রসারিত হয়ে বেরিয়ে যাবার দরুণই পয়সাটা ওঠা-নামা করে থাকে।

সূচ জলে ভাসাবার কৌশল

●

জল এবং অন্যান্য তরল পদার্থের তলটান (Surface tension) সম্পর্কিত সাধারণ একটা পরীক্ষার কথা বলছি। তোমরা অনেকেই হয়তো এই পরীক্ষাটা করে দেখেছ। তবুও সহজ ব্যবস্থায় কিভাবে করা যায়, সে কথাটাই জানিয়ে দিচ্ছি।

যে কোন তরল পদার্থের উপরিতলে সূক্ষ্ম একটা পর্দার মত



আস্তরণ থাকে। এই পর্দাটা তরল পদার্থের উপরিতলকে যেন বেশ জোর করে টেনে রাখে। একেই বলা হয় তলটান।

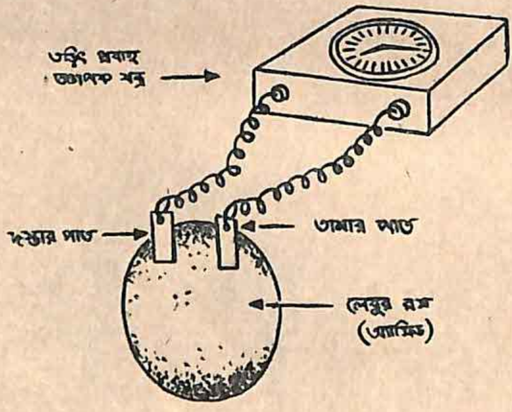
একটা সূচ বেশ ভাল করে শুকিয়ে নাও। তারপর ছবির মত

করে সূচটাকে একটা টেবিলের কাঁটার উপর রেখে জলভর্তি একটা পাত্রের মধ্যে কাঁটাটাকে ডুবিয়ে দাও। কাঁটাটা জলের নীচে যেতেই সূচটা জলের উপর ভেসে থাকবে। লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে, জলের উপরিতলটা যেন সূচটার ভারে খানিকটা নীচের দিকে বেঁকে গেছে। একটি ক্ষুরের ফলা দিয়েও ঠিক এরকমের পরীক্ষা করতে পার। খুব সতর্কতার সঙ্গে কাঁটাটাকে ডুবিয়ে দিতে পারলে প্রত্যেক বারেই সাফল্য লাভ করবে।

লেবু থেকে তড়িৎ-প্রবাহ উৎপাদন

●

এক টুক্‌রা তামার পাত এবং এক টুক্‌রা দস্তার পাত সংগ্রহ কর। অকেজো ড্রাই সেলের খোলা থেকে এক টুক্‌রা দস্তার পাত কেটে নিলেই চলবে। তামা ও দস্তার পাতের এক প্রান্তে ছিদ্র করে দুটিতেই খানিকটা সরু তামার তার জুড়ে দাও। একটা পাতিলেবু

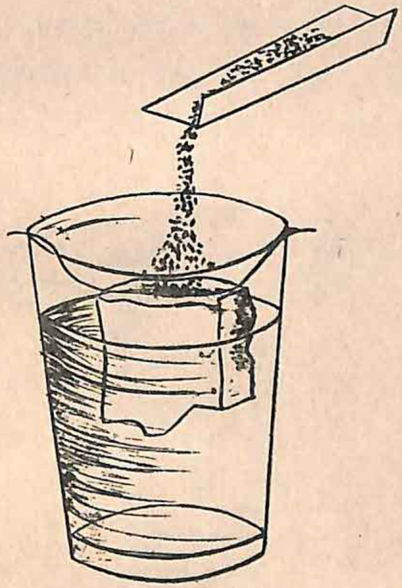


টেবিলের উপর রেখে সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জোর করে চাপ দিয়ে নরম করে নাও। এবার ছবির মত করে তামা ও দস্তার পাত দুটিকে লেবুটার গায়ে বেশ খানিকটা ঢুকিয়ে দাও। লক্ষ্য রাখবে, পাত দুটা যেন কোন রকমে পরস্পরের গায়ে না লাগে। তামার পাত সংলগ্ন

তারটা কোন একটা তড়িৎ-জ্ঞাপক যন্ত্রের এক প্রান্তে যোগ করে দাও। দস্তার পাত সংলগ্ন তারটা যন্ত্রের অপর প্রান্তে স্পর্শ করালেই দেখবে, তারের মধ্য দিয়ে খুব ক্ষীণ হলেও তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়ে যন্ত্রের কাঁটা খানিকটা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। লেবুর রসটা অ্যাসিড—কাজেই তামা ও দস্তার পাত সহ লেবুটা ইলেকট্রিক সেলের মতই কাজ করে।

হাত না লাগিয়ে বরফ-খণ্ড তোলবার উপায়

এক গ্লাস জলে এক খণ্ড বরফ ফেলে দিলে সেটা জলের মধ্যে ভেসে থাকবে। তোমার বন্ধুদের বল হাত দিয়ে স্পর্শ না করে তাদের

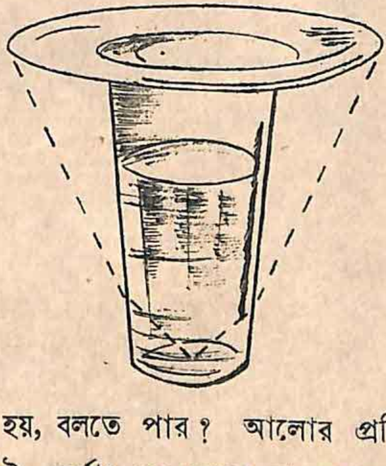


কেউ বরফ-খণ্ডকে জল থেকে তুলে আনতে পারে কিনা। কৌশলটা জানা না থাকলে হাত না লাগিয়ে কেউ সেটাকে তুলে আনতে পারবে না।

কৌশলটা খুবই সহজ। প্রায় ৪ ইঞ্চি লম্বা এক টুক্‌রা সূতা নাও। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি করে সূতাটাকে বরফখণ্ডের উপর রেখে দাও। এবার খানিকটা নুন এনে ঐ জায়গাতে ছড়িয়ে দাও। নুন দিলেই সূতার চারদিকের বরফ গলতে সুরু করবে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকেই বরফ ওই জলের তাপ টেনে নেবে। ফলে সূতাটার চারদিকে জল পুনরায় জমতে সুরু করবে এবং ২/১ মিনিটের মধ্যেই বরফখণ্ডের সঙ্গে সূতাটা শক্তভাবে এঁটে যাবে। এবার সূতাটার যে কোন এক প্রান্ত ধরে টানলেই বরফখণ্ড সূতার সঙ্গে উঠে আসবে।

ডাকটিকেট অদৃশ্যকরণ

উপরের দিকে মুখ করে টেবিলের উপর একটি ডাকটিকেট রেখে তার উপরে একটা জলভর্তি কাচের গ্লাস বসিয়ে দাও। উপর থেকে জলের মধ্যে দিয়ে টিকেটটাকে দেখা যাবে। এবার ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, সেভাবে গ্লাসটার মুখে একখানা পিরিচ বসিয়ে দিলেই দেখবে, ডাকটিকেটটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। গ্লাসটার চারদিক দিয়ে যে কোন ভাবেই চেষ্টা কর না কেন, ডাকটিকেটটাকে আর দেখা যাবে না।



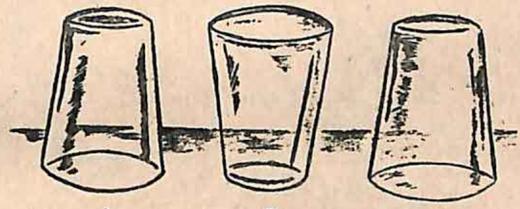
কেন এমন হয়, বলতে পার? আলোর প্রতিসরণের ফলেই এরূপ ব্যাপার ঘটে; অর্থাৎ এক রকমের মাধ্যম থেকে কৌণিকভাবে অন্য রকম মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যাবার সময় আলোকরশ্মি বেঁকে

যায়। ছবিতে কাটা কাটা লাইনে দেখানো হয়েছে আলোকরশ্মি জলের মধ্য দিয়ে বাতাসের মধ্যে প্রবেশ করবার সময় কেমন করে উপরের দিকে বেঁকে গিয়ে গ্লাসের মুখে বসানো পিরিচখানার নীচের দিকটায় পড়েছে। প্রতিসরিত আলো পিরিচের তলার দিকটায় বাধাপ্রাপ্ত হবার ফলে গ্লাসের কোন দিক থেকেই ডাকটিকেটটাকে দেখা যায় না।

তিন গ্লাসের খেলা

তিনটি গ্লাসের সাহায্যে গাণিতিক কৌশলের একটি খেলা দেখিয়ে তোমার বন্ধুদের অবাক করে দিতে পার।

টেবিলের উপর একসারে তিনটি খালি গ্লাস রাখ। মধ্যের গ্লাসটির মুখ থাকবে উপরের দিকে আর পাশের গ্লাস দুটিকে বসাবে উবুড় করে অর্থাৎ সেদুটির মুখ থাকবে নীচের দিকে। ছবিটি দেখলেই বুঝতে



A B C

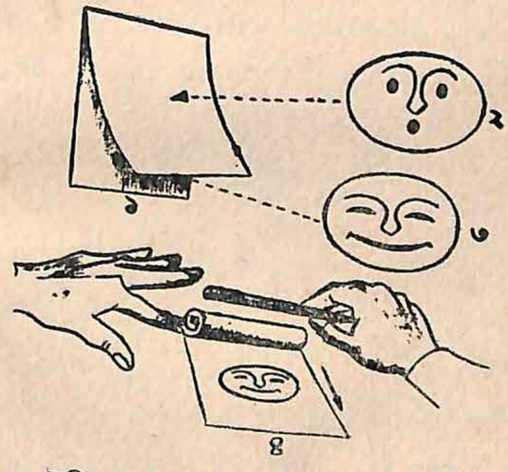
পারবে কেমন করে বসাতে হবে। এবার এক সঙ্গে দু-হাতে দুটি করে গ্লাস তুলে নিয়ে উল্টো করে বসিয়ে ঠিক তিন বারে এমন অবস্থায় আনতে হবে, যাতে তিনটি গ্লাসের মুখই উপরের দিকে থাকে। কেমন করে করা যায় বলে দিচ্ছি। প্রথমে AB গ্লাস দুটিকে দু-হাতে ধরে এক সঙ্গে উল্টে বসিয়ে দাও। দ্বিতীয় বারে AC গ্লাস দুটিকে উল্টে বসাও। তৃতীয় বারে AB গ্লাস দুটিকে উল্টে বসালেই দেখবে তিনটি গ্লাসের মুখই উপরের দিকেই হয়েছে।

এবার কথা বলার ফাঁকে, অন্যের অলক্ষ্যে মাঝের গ্লাসটা নীচের দিকে মুখ করে বসিয়ে দাও এবং বন্ধুদের বল তাদের মধ্যে কেউ তোমার মত করে ঠিক তিনবারে একসঙ্গে দুটি করে গ্লাস উল্টে দিয়ে সবগুলি গ্লাসের মুখ উপরের দিকে আনতে পারে কি না।

তুমি প্রথম আরম্ভ করেছিলে দুটি গ্লাসের মুখ নীচের দিকে এবং একটি গ্লাসের মুখ উপরের দিকে রেখে। কিন্তু এবার সাজাবার ব্যবস্থার সামান্য পরিবর্তনের ফলে এক সঙ্গে দুটি করে গ্লাস তিনবার বা যতবারই উল্টে দিক না কেন, কিছুতেই সবগুলি গ্লাসের মুখ একসঙ্গে উপরের দিকে আনতে পারবে না।

কাগজের চলচ্চিত্র

দৃষ্টিভ্রমের জন্য সিনেমার পর্দায় ছবিগুলিকে আমরা গতিশীল দেখে থাকি, একথা হয়তো তোমরা অনেকেই জান। ফিল্মের গায়ে মুদ্রিত বহুসংখ্যক স্থির ছবিকে অতি দ্রুতগতিতে পর পর পর্দার উপর ফেলে এরূপ দৃষ্টিভ্রমের সৃষ্টি করা হয়। কাগজের উপর আঁকা দুখানা ছবির সাহায্যে ব্যাপারটা তোমরা অনায়াসেই পরীক্ষা করে দেখতে পার।



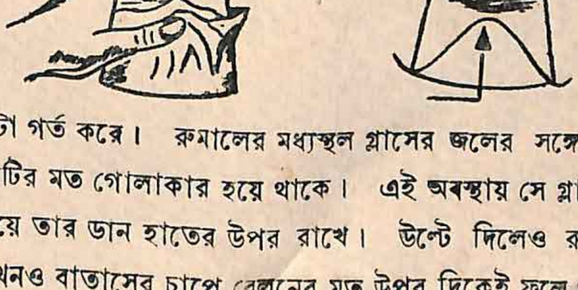
লম্বায় ৮ ইঞ্চি ও পাশে ৩ ইঞ্চি মাপের একটু মোটা ও শক্ত একখণ্ড কাগজ নিয়ে তাকে ১নং চিত্রের মত সমান দু-ভাঁজ কর।

উপরের কাগজখানাতে ২নং ছবির মত একটি এবং নীচের কাগজখানাতে ৩নং ছবির মত একটি ছবি এঁকে নাও। এবার উপরের ছবির কাগজখানাকে একটা পেন্সিলের গায়ে জড়িয়ে একটা চোঙের মত গুটিয়ে দিয়ে পেন্সিলটা খুলে নাও। পেন্সিলটা খুলে নিলেও কাগজখানা চোঙের মত গুটিয়ে থাকবে। এবার কাগজখানাকে টেবিলের উপর রেখে উপরের বাঁ-দিকের কোণে বাঁ-হাতের আঙ্গুলে চেপে ধরে ডান হাতে একটা পেন্সিলের সাহায্যে জড়ানো কাগজটাকে দ্রুতগতিতে একবার উপরের দিকে টানলে কাগজটার পাক খুলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গেই আবার পেন্সিলটাকে নীচে থেকে উপরের দিকে টানলে কাগজটা পুনরায় জড়িয়ে যাবার ফলে ৩নং ছবিটাকে দেখা যাবে। পেন্সিলটাকে বেশ তাড়াতাড়ি উপরে-নীচে বোলাতে হবে। এর ফলে মনে হবে ছবির মুখখানা যেন একবার হাসছে, আবার গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। চলচ্চিত্রের মূল রহস্যটি এ থেকেই বুঝতে পারবে।

উত্তাপ না দিয়ে জল ফোটানো

তোমরা অনেকেই হয়তো বেদেদের যাত্নর খেলা দেখে থাকবে। তবে তারা যেখানে-সেখানে খোলা জায়গায় নানারকম যাত্নর খেলার সঙ্গে তু-একটি বৈজ্ঞানিক খেলাও দেখিয়ে থাকে। সেগুলিকেও তারা অবশ্য যাতুবিদ্যা বলেই প্রকাশ করে। এখন তোমাদের কাছে এই রকমের একটা খেলার কথা বলছি।

যাতুকর প্রথমে একটা কাচের গ্লাসের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জলে ভর্তি করে গ্লাসের মুখে একটা ভিজা রুমাল ঢাকা দিয়ে দেয়। তারপর সেই রুমালের মাঝখানটা আঙ্গুল দিয়ে চেপে চেপে বাটির



মত একটা গর্ত করে। রুমালের মধ্যস্থল গ্লাসের জলের সঙ্গে লেগে গিয়ে বাটির মত গোলাকার হয়ে থাকে। এই অবস্থায় সে গ্লাসটাকে উল্টে নিয়ে তার ডান হাতের উপর রাখে। উল্টে দিলেও রুমালটা কিন্তু তখনও বাতাসের চাপে বেলুনের মত উপর দিকেই ফুলে থাকে।

এবার রুমালের ধারগুলি গ্লাসের গলার দিকে গুটিয়ে নিয়ে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক সেভাবে বাঁ-হাতে ধরে দর্শকদের বলে—যেই মাত্র আমি গ্লাসটার উপরে আঙ্গুল ঠেকাবো, যাদুবিদ্যার বলে তৎক্ষণাৎ গ্লাসের জল ফুটতে সুরু করবে।

উত্তাপ প্রয়োগে জল ফোটবার পূর্ব মুহূর্তে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ উঠতে দেখা যায়, এ ক্ষেত্রেও সে রকম বুদ্বুদ উঠতে থাকবে।

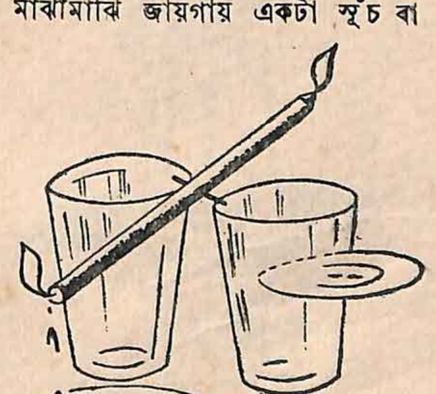
কেমন করে এটা হয়? ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়—গ্লাসের উপর আঙ্গুলের চাপ পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ-হাতে ধরা ভিজা রুমালটা গ্লাসের গায়ে পিছলে গিয়ে উপরের দিকে ওঠবার ফলে, অর্থাৎ গ্লাসটা ধরা জায়গার কিছুটা নীচে নামবার ফলে গ্লাসের মধ্যে আংশিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এর ফলে রুমালের সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বাতাস প্রবেশ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদের সৃষ্টি করে। দেখে ঠিক জল ফোটবার মত মনে হয়।



স্বয়ংক্রিয় মোমবাতির খেলা

এপর্যন্ত তোমাদের অনেক রকম খেলনা যন্ত্র তৈরীর কথা বলেছি। তাদের মধ্যে কোন কোনটা তৈরী করতে হয়তো কিছুটা দক্ষতার প্রয়োজন ; কিন্তু এখন তোমাদের এমন একটা স্বয়ংক্রিয় খেলনা তৈরীর কথা বলছি, যা তৈরী করা সবচেয়ে সহজ। ইচ্ছা করলে অল্প সময়ের মধ্যে খেলনাটা তৈরী করে পরীক্ষা করে দেখতে পারবে।

লম্বা একটা মোমবাতি সংগ্রহ কর। মোমবাতির সরু মুখটায় খানিকটা পল্‌তে বের করা থাকে। অপর দিকটা থাকে সমতল। সমতল দিকটার কিছুটা মোম ছুরি দিয়ে কেটে পল্‌তে বের করে দাও। এবার মোমবাতিটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা সূঁচ বা ছোট্ট একটা লোহার সরু তার পাশাপাশিভাবে এ-ফোঁড়-ওফোঁড় করে ঢুকিয়ে দাও। সমান মাপের দুটা কাচের গ্লাস পাশাপাশি রেখে মোমবাতিতে বেঁধা সূঁচটাকে তাদের কানার উপর বসিয়ে দাও। মোমবাতিটা এখন ঢেঁকিকলের

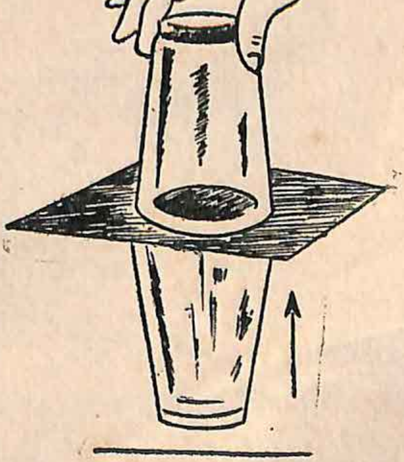


মত শয়ানভাবে অবস্থান করবে। যে কোন দিক থেকে একটু মোম কেটে নিলেই বাতির অপর দিকটা একটু ঝুলে পড়বে। এবার বাতিটার উভয় দিকের পল্‌তে দুটাই জ্বেলে দাও। যে দিকটা নীচে ঝুলে আছে, সেই দিকটার মোম অপর দিকের মোমের চেয়ে কিছুটা বেশী পরিমাণে গলে নীচে পড়বে। তার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেদিকটা হাল্কা হয়ে উপরে উঠে যাবে। তখন আবার অপর দিকের মোম বেশী পরিমাণে গলতে থাকবে। এভাবে বাতিটা যতক্ষণ পর্যন্ত নিঃশেষিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত। পর্যায়ক্রমে ওঠা-নামা করতে থাকবে।

ম্যাগ্‌ডিবুর্গ গ্লাস

●

'ম্যাগ্‌ডিবুর্গ হেমিস্ফিয়ার' নামে একটি বিখ্যাত পরীক্ষার কথা অনেকেরই জানা আছে। এটি বাতাসের চাপের সাধারণ একটা পরীক্ষা মাত্র। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে জার্মেনীর ম্যাগ্‌ডিবুর্গে লৌহ-নির্মিত দুটি শূন্যগর্ভ অর্ধগোলকের সাহায্যে বায়ুচাপের এই পরীক্ষাটি করা হয়েছিল। অর্ধগোলক দুটিকে একত্রিত করে একটি গোলক তৈরী করবার পর অনায়াসেই আবার তাদের পৃথক করা যেত। কিন্তু গোলক তৈরী করে অভ্যন্তরস্থ বায়ু নিষ্কাশন করবার পর অর্ধগোলক দুটিকে পৃথক করবার জন্যে এক এক দিকে চারটি করে ঘোড়া জুড়ে টানতে হয়েছিল। এই হলো সেই বিখ্যাত ম্যাগ্‌ডিবুর্গ পরীক্ষা।



খুব ছোটভাবে এই পরীক্ষাটি তোমরাও করে দেখতে পার। একই মাপের দুটি কাচের গ্লাস এবং এক খণ্ড ব্লটিং পেপার সংগ্রহ কর। ব্লটিং পেপার খানা বেশ করে জলে ভিজিয়ে নাও। এক

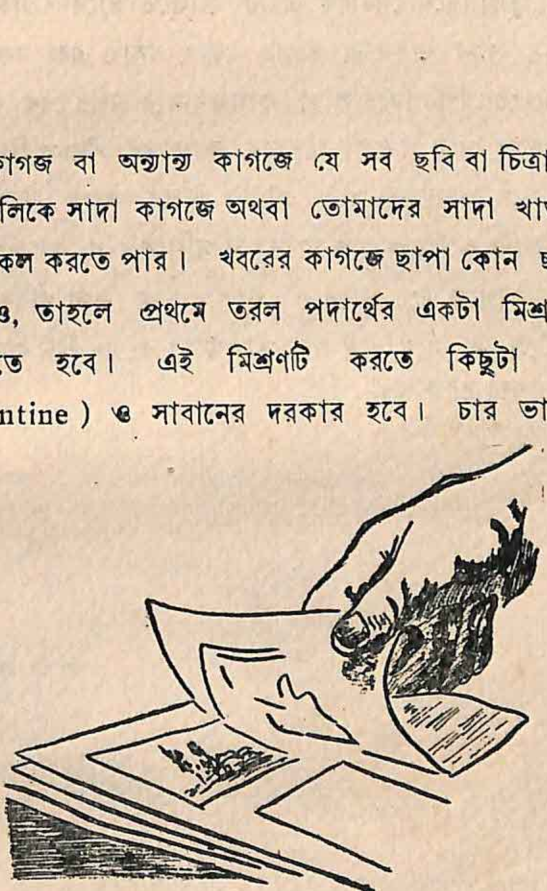
সঙ্গে কয়েকটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে সেই জ্বলন্ত কাঠিগুলিকে একটি গ্লাসের মধ্যে ফেলে দিয়ে ভিজানো ব্লটিং পেপারখানা গ্লাসের মুখে চাপা দাও। এবার অপর গ্লাসটিকে উবুর করে ব্লটিং পেপারের উপর একটু চেপে বসিয়ে দাও। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবে, ব্লটিং পেপার সমেত গ্লাস দুটি বেশ শক্তভাবে মুখে মুখে এঁটে বসে গেছে। উপরের গ্লাসটি টেনে তুললেই সঙ্গে সঙ্গে নীচের গ্লাসটিও উঠে আসবে।

ব্লটিং পেপার সচ্ছিদ্র হবার ফলে জ্বলন্ত কাঠিগুলি উপর ও নীচের উভয় গ্লাসের ভিতরকার অক্সিজেনই দহন করে ফেলবে। কাজেই ভিতরে চাপ হ্রাসের ফলে বাইরের বাতাসের প্রবলতর চাপ গ্লাস দুটিকে মুখে মুখে আট্কে রাখবে।



ছবি নকল করবার সহজ উপায়

খবরের কাগজ বা অন্যান্য কাগজে যে সব ছবি বা চিত্রাদি ছাপা হয়, সেগুলিকে সাদা কাগজে অথবা তোমাদের সাদা খাতায় খুব সহজেই নকল করতে পার। খবরের কাগজে ছাপা কোন ছবি যদি তুলতে চাও, তাহলে প্রথমে তরল পদার্থের একটা মিশ্রণ তৈরী করে নিতে হবে। এই মিশ্রণটি করতে কিছুটা তার্পিন (Turpentine) ও সাবানের দরকার হবে। চার ভাগ জলের



সঙ্গে একভাগ তার্পিন মিশ্রিত কর। পেন্সিলের মাথায় যেমন ছোট্ট এক টুক্‌রা রাবার লাগানো থাকে, ঠিক সেই রকম এক টুক্‌রা সাবান

তার্পিন মিশ্রিত জলে ফেলে দাও। সাবানের টুক্‌রাটা জলে গলে না যাওয়া পর্যন্ত পাত্রটাকে বেশ করে ঝাঁকুনি দিতে থাক। মিশ্রণের জল ও তার্পিনের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিভিন্ন ; কাজেই যেন আলাদা না হয়ে যায় সেই জন্যে সাবান দেওয়া দরকার।

যে ছাপানো ছবি নকল করতে চাও, মিশ্রণে ভিজানো একখণ্ড ন্যাকড়া বা তুলা দিয়ে সেটাকে এবার আল্‌তোভাবে ভিজিয়ে নিয়ে তার উপর সাদা একখানা কাগজ চেপে বসাও এবং মসৃণ একটি বাটী বা চামচের পিঠ দিয়ে সাদা কাগজখানার উপর বেশ কয়েকবার জোরে জোরে ঘষে দিলেই দেখবে, কাগজের নীচের পিঠে ছবিটা অবিকল উঠে এসেছে—তবে ছবিটা উঠবে অবশ্য উল্টোভাবে। তার্পিন ছাপার কালিকে বেশ খানিকটা গলিয়ে দেয়, কাজেই ছবিটার ছাপ সাদা কাগজে উঠে আসে। ঘসবার সময় ভিজা ছবির কাগজটা যাতে ছিঁড়ে না যায়, সে জন্য তার উপর কয়েক শীট বাজে কাগজ চাপিয়ে দেওয়া দরকার।

ম্যাজিক কাচ

তোমার কোন বন্ধুকে তিন অঙ্কের যে কোন একটি সংখ্যা লিখতে বল। তবে মনে রাখতে হবে, সংখ্যাটির প্রথম ও তৃতীয় অঙ্ক দুইটির মধ্যে যেন অন্তত: ২-এর তফাৎ থাকে। তোমার বন্ধু অবশ্য না দেখিয়ে যে কোন সংখ্যা লিখবে এবং তোমার নির্দেশ মত যোগ-বিয়োগ করে যে ফল পাবে, সেটা তুমি এক অদ্ভুত উপায়ে তাকে জানিয়ে দিতে পার। ধর, সে লিখলো ৩১৭। এবার তাকে সংখ্যাটা উল্টে লিখতে বল। তাহলে সংখ্যাটা হবে ৭১৩। ৭১৩ থেকে ৩১৭



বিয়োগ দিতে বল। বিয়োগ ফল হবে ৩৯৬। এই বিয়োগ ফল ৩৯৬-কে আবার উল্টে দিতে বল। উল্টে দিয়ে পাওয়া যাবে ৬৯৩। এবার ৩৯৬ ও ৬৯৩ যোগ দিতে বল। যোগফল হবে ১০৮৯।

এই নিয়ম অনুসারে যে কোন সংখ্যা নিয়ে যোগ-বিয়োগ করলেই দেখবে, তার ফল হবে—১০৮৯।

তোমার বন্ধুকে খেলাটার কথা বলবার আগে ঘরের কোন একটা কাচের জানালার গায়ে সাবান জলে একটা আঙ্গুল ডুবিয়ে সেই আঙ্গুল দিয়ে ১০৮৯ সংখ্যাটা লিখে রাখ। কিছুক্ষণের মধ্যেই লেখাটা শুকিয়ে যাবে। জানালার কাচ পরিষ্কারই থাকবে।

শেষ যোগফলটা বের করবার পর তোমার বন্ধুকে সেই নির্দিষ্ট জানালাটার কাছে গিয়ে কাচের উপর জোরে ফুঁ দিতে বল। বন্ধুটি দেখে অবাক হয়ে যাবে যে, কাচখানা কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু তার মধ্যে তারই লিখিত অঙ্কের যথাযথ উত্তর ১০৮৯ সংখ্যাটি ফুটে উঠেছে। এর কারণ আর কিছুই নয়—সাবান-জলে ডোবানো আঙ্গুল দিয়ে কাচের যে জায়গাটুকু স্পর্শ করা হয়—সেখানে কুয়াশা জমে না।

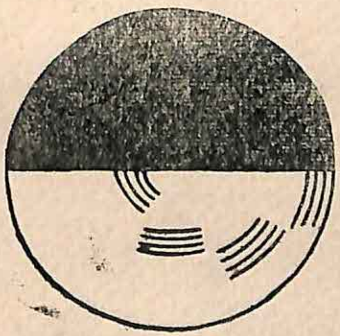
এই খেলাটা শীতকালেই ভাল দেখানো যায়। গরমের সময় ফুঁ দিলে কাচের গায়ে কুয়াশা জমবে না। তবে অবশ্য কৃত্রিম ব্যবস্থায় খেলাটা দেখানো যেতে পারে।

রং নেই তবুও রং দেখা

●

সাদা কাগজের একখানা গোলাকার চাক্‌তির গায়ে কালিতে ধাপে ধাপে কতকগুলি বৃত্তাংশ এঁকে চোখের সামনে সেটাকে জোরে ঘোরাতে থাকলে বিভিন্ন উজ্জ্বল রঙের কতকগুলি বৃত্তাকার রেখা দেখা যাবে।

পরীক্ষাটা কিভাবে করতে হবে—বলছি। প্রথমে ছবিটা ভাল করে দেখে নাও। তারপর সাদা কাগজের উপর কালো কালি দিয়ে



কম্পাসের সাহায্যে একটি বৃত্ত এঁকে নাও। বৃত্তের অর্ধেকটা কালো করে দিতে হবে। সাদা দিকটায় ছবির মত করে পর পর ধাপে ধাপে কতকগুলি বৃত্তাংশ এঁকে কাগজখানাকে গোল করে কেটে নিয়ে কার্ডবোর্ডের একটা চাক্‌তির উপর এঁটে দাও এবং চাক্‌তিটার

মধ্যস্থলে একটা সরু ছিদ্র করে ছিদ্রের মধ্যে বেশ বড় একটা আলপিন ঢুকিয়ে দাও। এবার আলপিনটাকে ধরে চাক্‌তিখানাকে চোখের সামনে ঘোরাতে থাকলেই বিভিন্ন উজ্জ্বল রঙের কতকগুলি বৃত্তাকার রেখা দেখতে পাবে। উল্টোদিকে ঘোরালে বর্ণ-রেখাগুলির অবস্থানও উল্টে যাবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে গুস্তব ফেক্‌নার নামে একজন জার্মান বিজ্ঞানী এই রকমের একটি চাক্‌তি তৈরী করে সর্বপ্রথম এই অদ্ভুত ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন। পদার্থ-বিজ্ঞানীরা একে বলেন subjective colour। আজ পর্যন্ত তাঁরা এই ব্যাপারটির প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে একমত হতে পারেন নি।

একই ফুলে দু-রকম রং করবার কৌশল

ডাঁটাসমেত একটা সাদা কারনেশন ফুল (অন্য কোন সাদা ফুল হলেও চলবে) নিয়ে এসে ডাঁটার খানিকটা অবধি দুভাগে চিরে নাও। এবার দুটা গ্লাসে জল ভর্তি কর। একটা গ্লাসের জলে একটু লাল রং (খাবার জিনিষে যে রং ব্যবহার করা হয়) মিশিয়ে দাও। জলটা লাল হয়ে যাবে। এবার রঙীন জল ও পরিষ্কার জলের গ্লাস



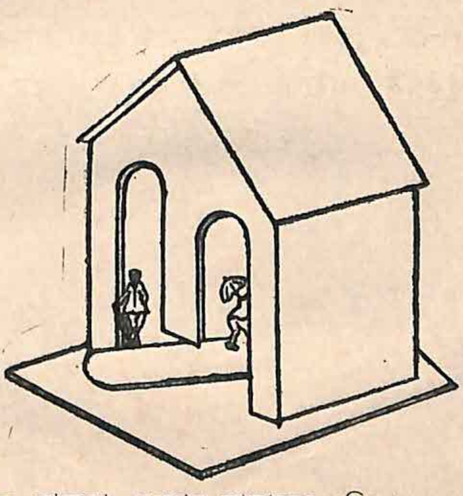
দুটাকে পাশাপাশি রেখে ফুলের চেরা ডাঁটার এক অংশ রঙীন জলে ও অপর অংশটাকে পরিষ্কার জলের মধ্যে বসিয়ে দাও। কেমন করে করতে হবে, ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে। কয়েক ঘণ্টা পরেই

দেখতে পাবে, সাদা ফুলটার অর্ধেকটা সুন্দর হাল্কা লাল রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে এবং অপর অর্ধেক সাদাই রয়ে গেছে।

ব্যাপারটা হলো এই যে, উদ্ভিদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৈশিক নলের মধ্য দিয়ে মাটি থেকে জল উপরে উঠে গিয়ে কাণ্ড, পাতা ও ফুলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও কর্তিত স্থান দিয়ে তরল পদার্থ উপরে উঠে যায়। এই পরীক্ষা থেকে তোমরা উদ্ভিদের রস-শোষণের বিষয়টাও বুঝতে পারবে।

আবহাওয়া ঘর

আবহাওয়ার অবস্থা জানবার জন্যে তোমাদের কাছে একটি চিত্তাকর্ষক খেলনা তৈরীর কথা বলছি। খুব সহজেই তোমরা খেলনাটি তৈরী করতে পারবে। তৈরী করতে লাগবে—প্রায় বারো ইঞ্চি লম্বা কয়েক গাছা মানুষের মাথার চুল অথবা ঐ মাপের একখণ্ড সরু ক্যাটগাট, কিছুটা শিরিষের আঠা। খানিকটা কার্ডবোর্ড আর ছোট্ট দুটি প্লাষ্টিকের পুতুল—তাদের একটির হাতে থাকবে একটি বন্ধ-করা ছাতা, অপরটির মাথায় থাকবে খোলা ছাতা। চুল ব্যবহার করলে সেগুলিকে

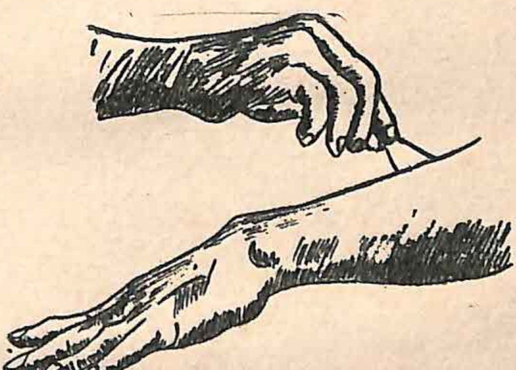


কষ্টিক সোডার হাল্‌কা দ্রবণের সাহায্যে পরিস্কার করে নিতে হবে। কিন্তু ক্যাটগাট ব্যবহার করলে কিছু করবার দরকার নেই।

জিনিষগুলি সংগ্রহ করবার পর কার্ডবোর্ডটি কেটে শিরিষের আঠায় জুড়ে ছবির মত একটি ঘর তৈরী কর। দরজা তুটির পাশাপাশি দৈর্ঘ্যের কিছুটা ছোট একফালি কার্ডবোর্ডের তুই দিকে প্লাষ্টিকের পুতুল তুটি আঠার সাহায্যে দাঁড় করিয়ে দাও। চুল ক'গাছা মোচড় দিয়ে এক প্রস্থ সুতার মত করে নাও। এবার চুল অথবা ক্যাটগাটের এক প্রান্ত পুতুল বসানো কার্ডবোর্ডের ঠিক মধ্যস্থলে এমন ভাবে এঁটে দাও, যাতে কার্ডবোর্ডের ফালিটা সমভূমিকভাবে ঝুলে থাকতে পারে। চুল অথবা ক্যাটগাটের অপর প্রান্ত ঘরের ভিতরের দিকে উপরের চালের সংযোগ-কোণের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। চুল এবং ক্যাটগাট উভয়েই জলাকর্ষী পদার্থ। কাজেই বাতাসে জলীয় বাষ্পের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুযায়ী চুল বা ক্যাটগাটের মোচড়ের তারতম্য ঘটবে এবং তার সঙ্গে ঝুলানো কার্ডবোর্ডের ফালিটিও ঘুরে যাবে। তার ফলে একটি পুতুল ঘরের ভিতরে ঢুকে যাবে এবং অপরটি বেরিয়ে আসবে। তু-একবার দেখে নিয়ে ক্যাটগাটের প্রান্তভাগ ঠিকমত চালে আট্‌কে দিতে পারবে। ছাতা-বন্ধ পুতুলটি বাইরে থাকলে পরিস্কার দিন, আর ছাতাখোলা পুতুলটি বাইরে এলেই বাদ্‌লা আবহাওয়ার সঙ্কেত বোঝা যাবে।

শরীরের স্পর্শানুভূতি

মেয়েদের চুলের কাঁটার দুটি বাহুর মধ্যে আধ ইঞ্চিরও কিছু কম ফাঁক থাকে। এরূপ একটি কাঁটার বাহু দুটিকে দু-দিকে টেনে ফাঁকটাকে দেড় ইঞ্চির মত বাড়িয়ে নাও। তোমার বন্ধুদের কাউকে চোখ বুজে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিতে বল। এবার ফাঁক-করা চুলের কাঁটার দুটি মুখই একসঙ্গে তার অগ্র বাহুতে চেপে ধরে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা কর—সে একটা না দুটা কাঁটার স্পর্শ অনুভব করছে। আশ্চর্যের বিষয়—দেড় ইঞ্চি তফাতে দুটা কাঁটার স্পর্শকে তার একটা কাঁটার



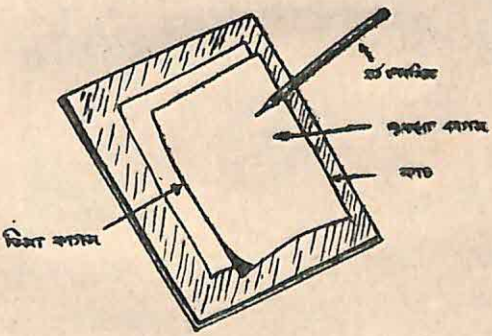
স্পর্শ বলেই মনে হবে ; অর্থাৎ দুটি পৃথক স্থানের স্পর্শকে সে একটি স্থানের স্পর্শের মত অনুভব করবে।

এবার চুলের কাঁটার বাহু দুটাকে চেপে খুব কাছাকাছি করে

দাও—ফাঁকটা যেন এক ইঞ্চির ষোল ভাগের এক ভাগের মত হয়। এই ক্ষুদ্র ফাঁকের কাঁটাটাকে এবার বন্ধুর আঙ্গুলের ডগায় চেপে ঠিক পূর্বের মতই পরীক্ষা কর। এবার কিন্তু সে দুটি স্পর্শকেই পৃথকভাবে অনুভব করবে—একটি স্পর্শ বলে ভুল করবে না। আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে স্পর্শানুভূতির অনেকটা পার্থক্য দেখা যায়। ইচ্ছা করলে তোমরা এই উপায়ে শরীরের বিভিন্ন অংশের স্পর্শানুভূতির পার্থক্য নির্ণয় করে একটা তালিকা প্রস্তুত করতে পার।

জলছাপের লেখা

তোমরা সবাই দেখে থাকবে নোট ষ্ট্যাম্প প্রভৃতির কাগজের গায়ে সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে জলছাপ দেওয়া থাকে। সাধারণ ভাবে দেখলে কাগজে জলছাপের কোন চিহ্নই নজরে পড়ে না। কিন্তু কাগজখানাকে জলে ডুবিয়ে বা ভিজিয়ে নিলে সেই ছাপ পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়। কাগজের উপর জোরে ছাপ দিয়ে জলছাপ তৈরী হয়ে থাকে। কাগজের যে সব জায়গায় জোরে চাপ পড়ে, সে সব জায়গার তন্তুগুলি বেশ চেপে বসে যায়। জলে ভিজিয়ে দিলে সে সব জায়গা থেকে প্রতিফলিত আলোর পথও কিছুটা পরিবর্তিত হয়। এই কারণেই



ভিজা কাগজে জলছাপ নজরে পড়ে থাকে। ইচ্ছা করলে তোমরাও খুব সহজেই জলছাপ দেবার কৌশলে সাদা কাগজে লিখে গোপন সংবাদটি আদান-প্রদান করতে পার।

কৌশলটা খুবই সহজ। একখণ্ড সাদা কাগজ জলে ভিজিয়ে নিয়ে সেটাকে একখানা পরিস্কার কাচ বা আয়নার উপর রাখ। এবার ভিজা কাগজখানার উপর আর একখানা শুক্‌নো কাগজ রেখে একটা হার্ড-পেন্সিলের সাহায্যে খুব চাপ দিয়ে তোমার বক্তব্য লেখ। এবার শুক্‌নো লেখা-কাগজখানা সরিয়ে নাও, দেখবে—নীচের ভিজা কাগজটাতে তোমার লেখাগুলি পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। কাগজখানা শুকিয়ে গেলে তাতে লেখার কোন চিহ্নই দেখা যাবে না। কিন্তু কাগজটাকে আবার জলে ডুবিয়ে নিলেই লেখাগুলি পরিস্কার দেখতে পাবে।

কেকের হারানো টুক্‌রা

●

চোখের ভুলের অনেক দৃষ্টান্তের কথা তোমরা শুনেছ। এবার দৃষ্টিবিভ্রমকারী আর একটা ছবি দিচ্ছি। চেষ্টা করে দেখো—এই রকম দৃষ্টিবিভ্রান্তিকর আর কোন ছবি আঁকতে পার কিনা। ছবিটি আঁকা হয়েছে যেন প্লেটের উপর একখানা কেক রাখা আছে এবং তার সামনের দিক থেকে তেকোনা একটু অংশ কেটে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কেটে নেওয়া টুক্‌রাটা গেল কোথায়? বইখানাকে উল্টে ধরে দেখ,



দেখবে টুক্‌রাটা হারিয়ে যায় নি, ওখানেই আছে। টুক্‌রাটার সোজা কালো রেখাগুলির জন্যে সামনে থেকে খালি জায়গা বলেই মনে হবে, কিন্তু উল্টে দেখলে ওই রেখাগুলির জন্যেই সেটাকে আবার নীরেট টুক্‌রা বলে মনে হবে। অবস্থানভেদ অথবা দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনের ফলে অনেক ব্যাপারে এই রকমের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে থাকে।

কাচের শিশি-বোতল কাটবার সহজ ব্যবস্থা

গৃহস্থালীর কাজে আমরা নানারকম কাচের শিশি-বোতল ব্যবহার করে থাকি। কানা বা গলা ভেঙে গেলে সেগুলি কোন কাজেই লাগে না। তাছাড়া অনেক সময় অব্যবহার্য শিশি-বোতল কোন কাজে লাগানো যায় না বলে কেবল জঞ্জালেরই সৃষ্টি হয়ে থাকে। এসব শিশি-বোতল যদি গলা বাদ দিয়ে সমান করে কেটে নেওয়া যায়, তবে গেলাস এবং অন্যান্য মোটামুখ পাত্রের কাজ চলতে পারে। তোমরা জান, কাচ-কাটা কলম দিয়ে কাচের দ্রব্যাদি কাটা যায়;



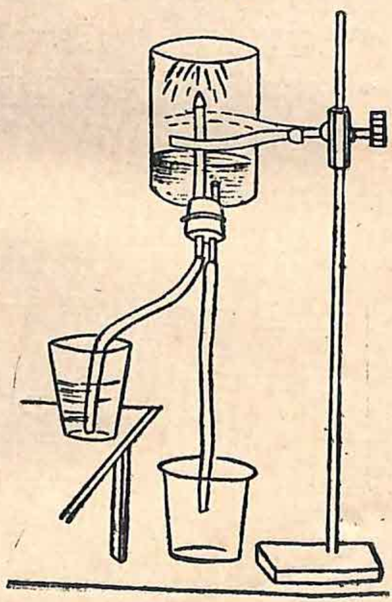
কিন্তু শিশি-বোতলের কাচ কাটতে গেলে বেশ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। সেই জন্যেই অতি সহজ উপায়ে শিশি-বোতল ইত্যাদি কাটবার ব্যবস্থার কথা বলছি। এই ব্যবস্থায় তোমরা যে কেউ কাচের বোতল প্রভৃতি অনায়াসে কাটতে পারবে।

ফুটদেড়েক লম্বা একটা মোটা লোহার তার জোগাড় করে সেটার মাথার দিকটা অর্ধ-বৃত্তাকারে বাঁকিয়ে নাও। এটিই হবে বোতল কাটবার যন্ত্র। ধর, একটা বোতলকে গলার নীচে কেটে গেলাসের মত একটা পাত্র তৈরী করতে হবে। এজন্যে বোতলের যেখানটা কাটতে হবে, সেখানে সাধারণ একটা উখা বা রেত্তি দিয়ে সামান্য একটা দাগ কেটে নাও। উখাটাকে দু-চারবার ঘষ্‌লেই বোতলের গায়ে দাগ কেটে যাবে। এবার লোহার বাঁকানো দিকটা বেশ করে আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে বোতলের ঘষ্‌ড়ানো দাগের উপর চেপে ধর এবং বোতলটাকে বাঁ-হাত ধরে আস্তে আস্তে ঘুরাতে থাক। দেখবে, সঙ্গে সঙ্গেই বোতলটা সেই লাইনেই ফেটে গিয়ে পরিষ্কারভাবে দু-ভাগ হয়ে যাবে। যদি দেখ উত্তপ্ত তার বুলানোর সঙ্গে সঙ্গে বোতলে ফাটল ধরছে না, তবে ফুঁ দিয়ে অথবা এক ফোঁটা জল ফেলে একটু ঠাণ্ডা করলেই সঙ্গে সঙ্গে ফেটে যাবে। দেখবে, কত সহজে ঠিক ছুরি দিয়ে কাটার মত বেশ সমানভাবে বোতলটা কেটে গেছে।

সাইফন ফোয়ারা

এবার সাইফনের সাহায্যে একপ্রকার স্বয়ংক্রিয় ফোয়ারা তৈরীর কথা বলবো। সাধারণ কয়েকটা জিনিষ দিয়েই এই ফোয়ারা তৈরী করতে পারবে।

মোটা মুঁখের বেশ সাদা একটা কাচের বোতল যোগাড় কর। আর যোগাড় করতে হবে, বোতলের মুখের খাপমত একটা কর্ক্ বা ছিপি, ৪ ইঞ্চি ও ২ ইঞ্চি লম্বা তুটি সরু কাচের নল এবং ছোট ও বড় তুটি রাবারের নল।



প্রথমে ছিপিটিতে কাচের নলের মাপমত তুটি ছিদ্র করতে হবে এবং ৪ ইঞ্চি লম্বা কাচের নলটার এক মুখ ড্রপারের মুখের মত সরু করে নিতে হবে।

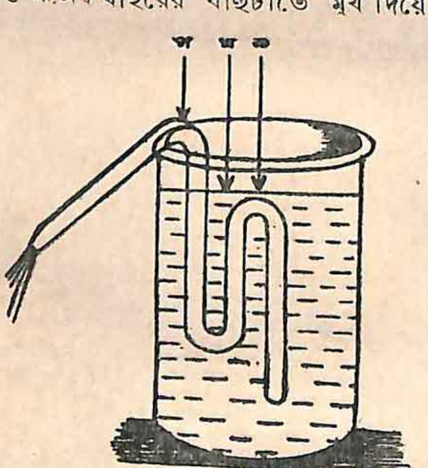
কাচের নল তুটিকে বেশ আঁট-ভাবে ছিপির ছিদ্রের মধ্যে এমন-ভাবে ঢুকিয়ে দাও যেন তুটি নলেরই আধ ইঞ্চি পরিমাণ অংশ ছিপিটার বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে। ছোট কাচের নলটার বাইরে বেরিয়ে থাকা মুখে রাবারের বড় নলটা এঁটে দাও। আর বড় কাচের নলটার বাইরে বেরিয়ে থাকা মুখে ছোট রাবারের নলটা

লাগিয়ে দাও। বোতলের এক চতুর্থাংশ জল দিয়ে ভর্তি কর। এবার কাচের নল লাগানো ছিপিটাকে বোতলের মুখে এঁটে বসিয়ে দাও। টেবিলের উপর বড় একটা গ্লাস ভর্তি জল রাখ।

এবার বোতলটাকে উল্টো করে, অর্থাৎ বোতলের তলার দিকটা উপরে আর মুখের দিকটা নীচের দিক করে টেবিলের চেয়ে উঁচু একটা ষ্ট্যাণ্ডের সঙ্গে এঁটে দিয়ে ছোট রাবারের নলটার সঙ্গে ড্রপারের মত সরু মুখের লম্বা কাচের নলটাকে জুড়ে দাও। খোলা মুখটা টেবিলের উপরে রাখা গ্লাসের জলের তলা অবধি ডুবিয়ে দাও। লম্বা রাবারের নলটার প্রান্তভাগ মেঝের উপর রাখা খালি পাত্রটার মধ্যে রাখতে হবে। দেখবে বড় নলটা দিয়ে বোতলের জল খালি পাত্রটার মধ্যে এসে জমা হচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসের জল কাচের সরু মুখ নলের ভিতর দিয়ে বোতলের খালি জায়গাটার মধ্যে ফোয়ারার মত ছিট্‌কে পড়ছে। গ্লাসের জল ফুরিয়ে গেলে আবার জল ভর্তি করে অথবা গ্লাসের পরিবর্তে বড় পাত্রে বেশী জল রেখে যতক্ষণ খুসী ফোয়ারা চালু রাখতে পার।

স্বয়ংক্রিয় সাইফন—১

এবার স্বয়ংক্রিয় সাইফনের কথা বলবো। ধর টেবিলের উপর এক গ্লাস জল রাখা আছে। গ্লাসটাকে কাৎ না করে সেই জল টেবিলের নীচে রক্ষিত পাত্রে কেমন করে আনা যায়? ইংরেজী U অক্ষরের মত ছোট-বড় করে বাঁকানো একটা কাচের নলে জল ভর্তি করে উল্টে নিয়ে বড় বাহুটা গ্লাসের জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। দেখবে, অপর বাহুটা দিয়ে গ্লাসের জল নীচে নেমে আসছে। নলটাতে জল ভর্তি না করেও নলের বাইরের বাহুটাতে মুখ দিয়ে একটু বাতাস



টেনে নিলেও জল পড়তে থাকবে। কিন্তু এছাড়াও আর এক রকমের সাইফন তৈরী করা যায়, যাতে জল ভর্তি করবার বা মুখ

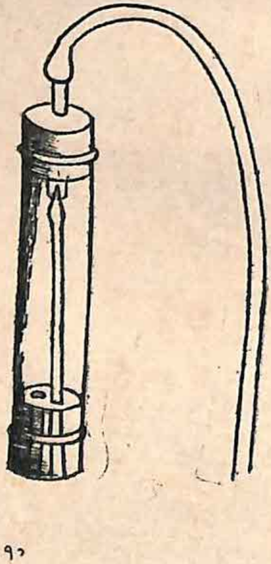
দিয়ে বাতাস টেনে নেবার প্রয়োজন হয় না, সাইফনটাকে গ্লাসের জলে বসিয়ে দেওয়া মাত্রই গ্লাসের সবটুকু জল আপনা-আপনিই নলের ভিতর দিয়ে নীচে নেমে আসবে।

ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, একটা লম্বা কাচের নলকে তেমনিভাবে তিন জায়গায় বাঁকিয়ে নাও। সেটাই হবে একটা স্বয়ংক্রিয় সাইফন। নলের সরু মুখটা গ্লাসের বাইরের দিকে রেখে সাইফনের বাকী অংশের সবটা গ্লাসে ডুবিয়ে দিলেই দেখবে গ্লাসের জল নলের সরু মুখটা দিয়ে ফোয়ারার মত সজোরে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসছে।

কেন এমন হয়? সাইফনের ক-চিহ্নিত বাঁকটি জলে ডুবে যাওয়া মাত্রই গ্লাসের জল নলের বাঁক ঘুরে খ-চিহ্নিত জলতলের সমতা রক্ষার জন্যে নলের অপর দুটি বাহুতেই উপস্থিত হবে এবং ইনার্সিয়ার দরুণ আরও খানিকটা উঠে গিয়ে গ-চিহ্নত বাঁক অতিক্রম করে সাইফন চালু করে দেবে। কাচের নল ছাড়া রাবার, প্লাষ্টিক বা অন্য কোন জিনিষের নল দিয়েও এরূপ সাইফন তৈরী করে পরীক্ষা করে দেখতে পার।

স্বয়ংক্রিয় সাইফন—২

এবার আর এক রকম সাইফনের কথা বলছি। প্রায় আড়াই সেন্টিমিটার ব্যাসের ৮ কি ১০ সেন্টিমিটার লম্বা দু-মুখ খোলা একটা প্লাষ্টিক অথবা কাচের চোঙ সংগ্রহ কর। এই চোঙের দু-মুখ এঁটে দেবার জন্যে দুটা কর্ক্‌ও যোগাড় করতে হবে। একটা কর্কের মধ্যস্থলে একটা ছিদ্র কর, অপর কর্ক্‌টাতে পাশাপাশি ছিদ্র করতে হবে। মাঝখানে ছিদ্র করা কর্ক্‌টার মধ্যে একটা কাচের নল ঢুকিয়ে দাও। দু-দিকের খানিকটা যেন কর্কের বাইরে বেরিয়ে থাকে।



এই কাচের নলের উপরের প্রান্তে বেশ লম্বা একটা রাবারের নল পরিয়ে দাও। এবার নল সমেত কর্ক্‌টিকে মোটা কাচের চোঙটার উপরের মুখে বেশ করে এঁটে বসিয়ে দাও। দুটি ছিদ্রযুক্ত কর্ক্‌টার একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়ে পিপেটের মত সরু মুখের একটা কাচের নল এমনভাবে বসাও যেন সরু মুখটা উপরের কর্কের মধ্য দিয়ে বের-করা নলের কিছুটা ভিতরে ঢুকে যায়। এই কর্কের উপরের দিকটা যেমন আছে, তেমনই থাকবে।

এবার জল ভর্তি একটা বালতি টেবিলের উপর রাখ এবং কর্ক্‌ আঁটা চোঙটাকে বালতির জলের মধ্যে নামিয়ে দিলেই হবে। দেখবে, বালতির সবটুকু জল কাণার উপর দিয়ে রাবারের নলের সাহায্যে নীচে চলে আসবে। ছবিটা ভাল করে দেখে নাও— কি করতে হবে. সহজেই বুঝতে পারবে। ডুবিয়ে দেওয়া মাত্র সাইফনের কাজ আরম্ভ না হলে চোঙটাকে একটু নেড়েচেড়ে ঠিকভাবে বসিয়ে দিলেই হবে।